যুগসন্ধিক্ষণে আমরা

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

যুগসন্ধিক্ষণে আমরা

২৩ শে সেপ্টেম্বর' ৯৪, করটিয়ায় অনুষ্ঠিত সুধী সম্মেলনে হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর ভাষণ,

আমাদের, অর্থাৎ আমরা যারা নিজেদের মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদী বলে মনে করি, আমাদের ইতিহাস কি? আমরা কোথা থেকে এসেছি, কেমন করে আমাদের জন্ম হয়েছে, কেন আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, কি উদ্দেশ্যে আমাদের একটি জাতি হিসেবে গঠন করা হয়েছে? আজকের এই একশ' ষাট কোটির জাতির মনে এই প্রশ্নগুলি জাগে না। কেউ এই প্রশ্নগুলি করলে একশ' ষাট কোটির কাছ থেকে অন্তত দশকোটি রকমের বিভিন্ন উত্তর পাওয়া যায়। চৌদ্দশ' বছর আগে যখন এই জাতিটির জন্ম হয়েছিল আল্লাহর রসুল তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা, অতুলনীয় ত্যাগ, অবিচল নিষ্ঠা, অটল অধ্যবসায় এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে এই জাতিটিকে গঠন করেছিলেন তখন কিন্তু ঐ জাতির প্রত্যেকটি মানুষকে উপরোক্ত ঐ প্রশ্নগুলি করলে সবাই একই উত্তর দিতেন, কোনো মতভেদ ছিল না। ঐ জাতির ইতিহাস হচ্ছে এই যে, জাতিটি গঠিত হবার পঁচিশ বছরের মধ্যে তদানিন্তন পৃথিবীর দুইটি মহাশক্তিকে সশস্ত্র সংগ্রামে, যুদ্ধে পরাজিত করে সমগ্র মধ্য এশিয়ায় আল্লাহর আইনের শাসন কার্যকরী করেছিল। ঐ মহাশক্তিশালী সাম্রাজ্য দুইটি ছিল রোমান ও পারসিক, একটি খ্রিষ্টান অপরটি অগ্নি উপাসক। সংখ্যায়, সম্পদে, সামরিক বাহিনীর সংখ্যায়, অস্ত্রশস্ত্রে, এক কথায় সবদিক দিয়ে ঐ দুইটি বিশ্বশক্তি ছিল ঐ শিশু জাতির চেয়ে বহুগুণে বড় কিন্তু তবুও তারা ঐ সদ্যপ্রসূত ছোট্ট জাতির সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। খ্রিষ্টান শক্তিটি পরাজিত হয়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকেই পালিয়ে গেলো; আর অগ্নি উপাসক শক্তিটি আল্লাহর দীনকে স্বীকার করে নিয়ে ঐ নতুন জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো; আজ যেটাকে আমরা ইরান বলি। তারপর ৬০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ঐ জাতিটি তখনকার দিনের অর্ধেক পৃথিবী জয় করে আল্লাহর আইনের শাসনের অধীনে নিয়ে এলো। এই পর্যন্ত ঐ জাতির ইতিহাস শুধু জয়ের ইতিহাস, বিজয়ের ইতিহাস, তাদের চেয়ে বহুগুণে শক্তিশালী শক্তির বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সামরিক বিজয়ের ইতিহাস।

ঐ সামরিক বিজয়ের উদ্দেশ্য কি ছিল? সাম্রাজ্য? নাকি অন্য ধর্মের লোকজনকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা? না, এর কোনটাই নয়। এর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ছিল ঠিক তাই যে উদ্দেশ্য, যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল্লাহর নির্দেশে তাঁর শেষ রসুল এই জাতিটিকে, এই উম্মাহটি

গঠন করেছিলেন, আর সেটি হলো সশস্ত্র সংগ্রাম করে সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহর আইন-কানুন অর্থাৎ দীন প্রতিষ্ঠা ও কার্যকরী করে মানব জাতির ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সমস্ত অন্যায়, অবিচার, শোষণ, অত্যাচার নিঃশেষ করে দিয়ে ন্যায়, সুবিচার, নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। আর এই জন্যই এই দীনের নাম ইসলাম, আক্ষরিক অর্থেই শান্তি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, আদম (আ.) থেকে মোহাম্মদ (দ.) পর্যন্ত ঐ একই নাম, ইসলাম বা শান্তি। আজ আমাদের ধর্মীয় ও অধর্মীয় (অর্থাৎ রাজনৈতিক) নেতারা যে অর্থে ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলেন তার ঠিক বিপরীত অর্থ। রাষ্ট্রশক্তি অধিকার না করলে আল্লাহর আইন কেন, কোনো আইনই প্রতিষ্ঠা বা কার্যকরী করা যায় না এটা সাধারণ জ্ঞান আর রাষ্ট্রশক্তি কেউ বিনা যুদ্ধে ছেড়ে দেয় না, এটাও জানা কথা। তাই রাষ্ট্রশক্তি তাদের অধিকার করতে হয়েছে সশস্ত্র সংগ্রামে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একটি মানুষকেও তারা তার ধর্ম ত্যাগ করে এই দীন গ্রহণে বাধ্য করেন নি। শুধু তাই নয়, যেখানেই তারা আল্লাহর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন সেখানেই অন্য ধর্মের চার্চ, সিনাগগ, মন্দির ও প্যাগোডা রক্ষার দায়িত্ব তো নিয়েছেনই তার উপর ঐ সব ধর্মের লোকজনের যার যার ধর্ম পালনে কেউ যেন কোনো অসুবিধা পর্যন্ত না করতে পারে সে দায়িত্বও তাঁরা নিয়েছেন। অন্যান্য ধর্মের লোকজনের ধর্মের নিরাপত্তার যে ইতিহাস এই জাতি সৃষ্টি করেছে তা মানব জাতির ইতিহাসে অনন্য, একক, পৃথিবীর কোনো জাতি তা করতে পারে নি। অর্ধেক পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রবর্তন করার ফলে ঐ সমস্ত এলাকায় লুপ্ত হয়ে গেলো শোষণ, অবিচার, অন্যায়, নিরাপত্তাহীনতা অর্থাৎ ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা। প্রতিষ্ঠিত হলো সুবিচার; ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সুবিচার ও নিরাপত্তা; এক কথায় শান্তি।

এরপর ঘটলো এক মহাদুর্ভাগ্য জনক ঘটনা। ঐ জাতি হঠাৎ তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভুলে গেলো। ভুলে গেলো তার জন্ম হয়েছে কেন, ভুলে গেলো তাকে গঠন কেন করা হয়েছিল, ভুলে গেলো আল্লাহর রসুল স্বয়ং প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে পৃথিবীতে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিতে কেন পরিণত করেছিলেন। জাতি ভুলে গেলো যে কাজের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, গঠন করা হয়েছে, প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে সেই কাজ ছেড়ে দেওয়া আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। কিন্তু জাতির লোকদের আকিদা অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণা বিকৃত হয়ে যাওয়ায় জাতি তাই করলো, আল্লাহর দীন সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জেহাদ অর্থাৎ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ত্যাগ করলো এবং ত্যাগ করে অন্যান্য রাজা বাদশাহরা যেমন রাজত্ব করে তেমনি শান শওকতের সঙ্গে তাদের মতই রাজত্ব করতে শুরু করলো। এই সর্বনাশা কাজের অর্থ কি, পরিণতি কি তা তারা উপলব্ধি করতে পারলেন না। তারা উপলব্ধি করতে পারলেন না যে, যে জিনিস যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয় সেটা যদি সেটাকে দিয়ে না হয়, তবে আর ঐ জিনিসের কোনো দাম থাকে না, সেটা অর্থহীন হয়ে যায়। একটা ঘড়ির উদ্দেশ্য হচ্ছে সময় জানা, ঘড়িটা যদি না চলে, সময় না দেখায়, এমন কি যদি ভুল সময় দেখায় তবে আর সে ঘড়িটার কোনো দাম থাকে না। ঘড়িটা সোনা, হীরা, জহরত দিয়ে তৈরি করলেও না। একটি গাড়ি যদি কোনো কারণে অচল হয়ে যায়, বা আকিদার ভুলে সেটাকে ব্যবহার না করে গ্যারেজে রেখে দেওয়া হয় তবে সে গাড়ির আর কোনো মূল্য থাকে না, সেটা পৃথিবীর সবচেয়ে দামী

গাড়ি হলেও না, কারণ যে উদ্দেশ্যে গাড়িটিকে তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া তা আর সেটাকে দিয়ে হচ্ছে না। শান-শওকতের সঙ্গে রাজত্ব করার মোহ তাদের এমনভাবে পেয়ে বসলো যে তারা ভুলে গেলেন আল্লাহ কোর'আনে মো'মেন হবার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার মধ্যে ঐ জেহাদ অঙ্গীভূত করা আছে। সুরা হুজরাতের ১৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-"সত্যনিষ্ঠ মো'মেন শুধু তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তারপর (সে সম্বন্ধে) আর কোনো সন্দেহ করে না (অর্থাৎ এ বিশ্বাসের উপর দৃঢ়, অবিচল থাকে) এবং তাদের সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে।" তারপর তিনি আবার বলেছেন সুরা তওবার ১১১ নং আয়াতে- "নিশ্চয়ই আল্লাহ মো'মেনদের জীবন ও সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন, তারা আল্লাহর রাস্তায় কেতাল (অর্থাৎ- সশস্ত্র সংগ্রাম) করে, হত্যা করে এবং নিহত হয়। এটা এমন একটা প্রতিশ্রুতি যে প্রতিশ্রুতিতে আল্লাহ তওরাত, ইঞ্জিল ও কোর'আনে আবদ্ধ হয়ে আছেন। নিজের প্রতিশ্রুতি পালনে আল্লাহর চেয়ে বড় আর কে আছেন? কাজেই তোমরা যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দ কর, কারণ এই সওদা হচ্ছে চূড়ান্ত সাফল্য।"

এছাড়া কোর'আনের অন্যত্রও আল্লাহ মো'মেন কে এবং কারা তার সংজ্ঞা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন এবং এই সংজ্ঞায় আল্লাহ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস ও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ এই দুই শর্ত রয়েছে। কাজেই এই জাতির পথভ্রষ্ট লোকেরা যখন নীতি হিসাবে জেহাদ ত্যাগ করলেন তখন তারা বুঝলেন না যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দৃষ্টিতে আর তারা মো'মেন রইলেন না। তাদের ঐ দুর্ভাগ্যজনক কাজের ন্যায্যতা প্রমাণের চেষ্টায় তারা হাদীস উদ্ভাবন করলেন নফসের সঙ্গে জেহাদই হচ্ছে জেহাদে আকবর, বড় জেহাদ। এই হাদীসের সংকলক ইমাম বায়হাকি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এই হাদীসের সনদ ত্রুটিযুক্ত এবং এই দয়িফ হাদীস সম্বন্ধে হাফেয ইবনে হাজ্জার প্রমুখ মোহাদ্দেসরা বলেছেন, এটা কোনো হাদীসই না, এটা একটা আরবি প্রবাদ বাক্য মাত্র। তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে কোনো হাদীস সহীহ কি না তা যাচাই করার প্রথম কষ্ঠিপাথর হচ্ছে কোর'আন। সেই কোর'আনেই আল্লাহ স্বয়ং আমাদের বলে দিচ্ছেন বড় জেহাদ অর্থাৎ জেহাদে আকবর বা কবীর কোনটা। সুরা ফোরকানের ৫২ নং আয়াতে তিনি বলেছেন, "সুতরাং কাফেরদের কথামত চলো না এবং এর (কোর'আনের) সাহায্যে তাদের সঙ্গে বড় জেহাদ কর। জেহাদান কবীর কর।" অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদই হচ্ছে জেহাদে আকবর, নফসের সঙ্গে নয়।

শুধু তাই নয়, জেহাদ ত্যাগ করেই তারা ক্ষান্ত হলেন না। তারা রসুলের সুন্নাহরও ভিন্ন সংজ্ঞা আবিষ্কার করলেন। আল্লাহ কোর'আনে অন্তত তিনবার বলেছেন যে, তিনি (আল্লাহ) তাঁর রসুলকে সঠিক দিক নির্দেশনা ও সত্যদীন দিয়ে পাঠিয়েছেন এই জন্য যে তিনি এটাকে অন্যান্য সমস্ত দীনের ওপর বিজয়ী করবেন। এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নবী ঘোষণা করলেন- "আমি আদিষ্ট হয়েছি সমস্ত মানব জাতির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যেতে যে পর্যন্ত না তারা একথা মেনে নেয় যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, এবং মোহাম্মদ (দ.) তাঁর রসুল" (হাদীস– আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বুখারী)। ইতিহাস সাক্ষী যতদিন তিনি এই দুনিয়ায় ছিলেন ততদিন তিনি ও তাঁর আসহাব একদেহ

একপ্রাণ হয়ে আল্লাহর দেয়া ঐ আদেশ ও দায়িত্ব পালন করে গেছেন এবং তা করতে যেয়ে মাত্র ১০ বছরের মধ্যে ১০৭টি ছোট বড় যুদ্ধ করেছেন। তারপর যখন আল্লাহর রসুল এই দুনিয়া থেকে চলে গেলেন তখন ঐ দায়িত্ব স্বভাবতই এসে পড়লো তাঁর গঠন করা জাতিটির ওপর কারণ রসুলের ওপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব তখনও পূর্ণ হয় নি। শুধু আরব দেশটাকে আল্লাহর আইনের শাসনের মধ্যে আনা হয়েছে; বাকী পৃথিবী মানুষের তৈরি আইনের অধীনে চলছে। রসুলাল্লাহর নিজ হাতে গড়া জাতিটি অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদী তার জান্নাতবাসী নেতার ওপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব তাদের মাথায় এসে পড়া সম্বন্ধে এত সচেতন ছিলেন যে নেতার দুনিয়া থেকে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি-ঘর, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার, পরিবার-পরিজন, এক কথায় পার্থিব সব কিছু কোরবান করে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণ করতে অস্ত্র হাতে তাদের স্বদেশ আরব থেকে বের হয়ে পড়েছিলেন। এই কাজকে তাদের নেতা বলেছিলেন আমার সুন্নাহ, সুন্নাতি এবং বলেছিলেন আমার এই সুন্নাহ যে বা যারা ত্যাগ করবে তারা আমার কেউ নয়, মান তারাকা সুন্নাতি ফালাইসা মিন্নি, অর্থাৎ তারা উম্মতে মোহাম্মদীই নয়। শুধু তাই নয়, তিনি বলেছেন- মান রাগেবা আন সুন্নাতি ফালাইসা মিন্নি (বুখারী, মুসলিম) অর্থাৎ যে আমার সুন্নাহ থেকে শুধু মুখ ফিরিয়ে নেবে সেও আমার কেউ নয়। জেহাদ ছেড়ে দেবার পর নবীর সুন্নাহর বিকল্প হিসাবে নেয়া হলো তাঁর ব্যক্তিগত অভ্যাস-অনভ্যাস, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি যেগুলোর সাথে তাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁর উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্বের কোনো সম্বন্ধই নেই; যেগুলো নেহায়েৎ ব্যক্তিগত ব্যাপার। নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, জেহাদ ত্যাগকারীদের কাছে মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবীর সুন্নাহ হয়ে দাঁড়ালো, তাঁর বিপ্লব নয়, তাঁর মেসওয়াক করা, খাবার আগে জিহ্বায় একটু নিমক দেওয়া, খাবার পর একটু মিষ্টি খাওয়া, ডান পাশে শোয়ার মতো ছোট-খাট অসংখ্য তুচ্ছ ব্যাপার। মানুষের ইতিহাসে কোনো জাতি তার নেতার এমন অপমানকর অবমূল্যায়ন করেছে বলে আমার জানা নেই। জেহাদ ত্যাগ করে ঐ জাতি মো'মেন ও উম্মতে মোহাম্মদীর সংজ্ঞা থেকে বহিস্কৃত হয়ে যাওয়া ছাড়াও আরও ভয়ংকর পরিণতি হলো। তাহলো এই যে আল্লাহ সুরা তওবায় ৩৮ এবং ৩৯ নং আয়াতে এই জাতিকে জেহাদ ছেড়ে দেবার পরিণতি সম্বন্ধে এই বলে সাবধান করে দিয়েছেন- "হে মো'মেনরা তোমাদের কি হয়েছে যে যখন তোমাদের বলা হয় আল্লাহর পথে (সামরিক) অভিযানে বের হও, তখন যেন তোমরা ঝুঁকে পড়ে মাটির সাথে মিশে যাও। (তাহলে কি) তোমরা পরকালের পরিবর্তে এই জীবনকেই প্রাধান্য দিয়েছ? এই জীবনের ভোগ তো পরকালের জীবনের তুলনায় অতি সামান্য। যদি তোমরা সামরিক অভিযানে বের না হও তবে তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য কোনো জাতিকে প্রতিষ্ঠা করবেন (অর্থাৎ তোমাদের অন্য কোনো জাতির দাস, গোলাম বানিয়ে দেবেন) এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না, আল্লাহ সমস্ত কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।" এই কঠোর সতর্কবাণী সত্ত্বেও আকিদা অর্থাৎ জাতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সঠিক সম্যক ধারণার (Comprehensive Conception) বিকৃতিতে এই জাতি জেহাদ ছেড়ে দিয়ে নফসের সাথে নিরাপদ জেহাদ শুরু করলো। আল্লাহও তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কিছুদিন পরই ইউরোপের খ্রিষ্টান জাতিগুলিকে দিয়ে ঐ জাতিকে সামরিকভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে শাসনভার ও কর্তৃত্ব তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে খ্রিষ্টানদের হাতে তুলে দিলেন।

আল্লাহ কোর'আনের বিভিন্ন স্থানে এবং সুরা নূরের ৫৫ নম্বর আয়াতে মো'মেনদের এই পৃথিবীর আধিপত্য ও কর্তৃত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে যতদিন ঐ জাতি, জাতি হিসাবে জেহাদ চালিয়ে গেছে ততদিন আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন- অর্ধেক পৃথিবীতে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ঐ জাতি যদি তখন জেহাদ ত্যাগ না করতো তবে অবশ্যই আল্লাহ বাকি অর্ধেকও তাদের হাতে তুলে দিতেন এবং রসুলের ওপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্বও পূর্ণ হতো। আল্লাহর ঐ প্রতিশ্রুতির মধ্য থেকে আরেকটি সত্য ফুটে ওঠে- সেটা হলো এই যে, আমরা নিজেদের মো'মেন অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাসী বলে দাবি করি। তাহলে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পৃথিবীর কর্তৃত্ব, আধিপত্য আমাদের হাতে নেই কেন? তাহলে সেই সর্বশক্তিমান কি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে অসমর্থ (নাউযুবিল্লাহে মিন যালেক)? এর একমাত্র জবাব হচ্ছে- আমরা যতই নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, যতই হাজার রকম ইবাদত করি, যতই মুত্তাকী হই, আমরা মো'মেন নই, মুসলিম নই, উম্মতে মোহাম্মদী হবার তো প্রশ্নই ওঠে না। মো'মেন হলে (ইন কুন্তুম মো'মেনীন) যে পৃথিবীর ওপর আধিপত্যের অঙ্গীকার আল্লাহ করেছেন, সেই পৃথিবীতে আজ আমাদের অবস্থা কী? আমাদের অবস্থা হচ্ছে (ক) পৃথিবীতে যে কয়টি প্রধান জাতি আছে তার মধ্যে আমরা নিকৃষ্টতম। (খ) আমাদের ছাড়া আর যে কয়টি জাতি আছে তারা সকলেই পৃথিবীর সর্বত্রই আমাদের অপমানিত, অপদস্থ করছে, আমাদের আক্রমণ করে হত্যা করছে, আমাদের ধন-সম্পদ লুটে নিচ্ছে, আমাদের বাড়ি-ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে, আমাদের মা, মেয়ে, বোনদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে সতিত্ব নষ্ট করছে। (গ) ঐ কাজগুলি খ্রিষ্টানরা অতীতে করেছে স্পেনে, সেখান থেকে তারা সম্পূর্ণ মুসলিম জাতিটিকেই সমূলে উৎখাত করেছে, আজ সেখানে মুসলিম বলতে নেই এবং বর্তমানে করছে বসনিয়া হারযেগোভিনিয়ায়, সুদানে, ফিলিপাইনে (এটি ১৯৯৪ সনের প্রেক্ষাপট- প্রকাশক)। খ্রিষ্টানরা বসনিয়ায় যা করেছে মানব জাতির ইতিহাসে তার কোনো নজির নাই। তারা দুই লক্ষ মুসলিম মেয়েকে ধর্ষণ করে গর্ভবতী করেছে, তাদের সাতমাস পর্যন্ত আটকে রেখেছে যাতে তারা ঐ খ্রিষ্টানদের ঔরসের সন্তানগুলি গর্ভপাত করে ফেলে দিতে না পারে। বসনিয়ায় কয়েক হাজার মসজিদের মধ্যে সারায়েভোর কয়েকটি মাত্র মসজিদ ছাড়া আর সমস্ত মসজিদ ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। হিন্দুরা করছে কাশ্মিরে, ভারতের প্রতিটি রাজ্যে। বৌদ্ধরা করছে মায়ানমারে অর্থাৎ বার্মায়, আরাকানে, থাইল্যান্ডে, ভিয়েতনামে, কামপুচিয়ায় ও চীনে। এগুলিতো বড় বড় জাতি। অতি ক্ষুদ্র ইহুদি জাতি ঐ কাজ করছে পশ্চিম এশিয়ায়, প্যালেস্টাইনে। ভারতে দশ হাজারের বেশী মসজিদ হয় মন্দীরে পরিণত করা হয়েছে না হয় অফিস ইত্যাদি অন্য কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, না হয় ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। এটা ১৯৮৫ সালের হিসাব। ক্ষুদ্র ইহুদি জাতিকে দিয়ে ১৯৪৭ সন থেকে আজ পর্যন্ত গুতিয়ে মেরেও খুশী না হয়ে অপমানের, শাস্তির চূড়ান্ত করার জন্য গাছ পাথর উপাসক আসামের একটি পাহাড়ী উপজাতি দিয়ে আল্লাহ এই জাতিকে পেটাচ্ছেন, গুলী করে, কুপিয়ে হত্যা করাচ্ছেন, বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে উচ্ছেদ করাচ্ছেন। আর কত শাস্তি, কত আযাব আল্লাহ দেবেন? এর পরের ধাপের শাস্তিতো একেবারে নির্মূল করে দেয়া- যেমন দিয়েছেন স্পেনের তথাকথিত মুসলিমদের, সেখানে এখন তাদের নাম গন্ধও নেই।

আল্লাহর নবী ঈসাকে (আ.) প্রত্যাখ্যান করার শাস্তি হিসাবে আল্লাহ ইহুদি জাতিকে লা'নত অর্থাৎ অভিশাপ দিয়েছিলেন, যার ফলে খ্রিষ্টান রোমানরা তাদের হাজার হাজার বছরের স্বদেশ থেকে মেরে কেটে উৎখাত করে দিয়েছিল। প্রাণ বাঁচাবার জন্য তারা পালিয়ে যেয়ে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছিল। আল্লাহর অভিশাপ তাদের পেছনে পেছনে গেছে। যেখানেই তারা আশ্রয় নিয়েছে, বসতি স্থাপন করেছে সেখানেই তাদের ঘৃণার চোখে দেখা হয়েছে, অবজ্ঞা করা হয়েছে। মাঝে মাঝেই খ্রিষ্টানরা দলবেধে ইহুদিদের বসতি আক্রমণ করে তাদের পুরুষদের হত্যা করে মেয়েদের নিয়ে গেছে, তাদের সম্পত্তি লুটপাট করেছে, বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। ইউরোপের প্রতিটি রাষ্ট্রে এটা হয়েছে এবং বারবার হয়েছে। এই কাজটাকে বোঝাবার জন্য ইউরোপীয় ভাষায় একটি নতুন শব্দেরই জন্ম হয়েছে Pogrom, যার আভিধানিক অর্থ হলো Organised killing and plunder of a community of people, বাংলায়- সুসংগঠিতভাবে সম্প্রদায় বিশেষের হত্যা ও লুণ্ঠন। আল্লাহ লা'নত দেবার পর ইহুদিদের ভাগ্যে যা ঘটেছিল আজ মুসলিম নামের এই জাতিটির ওপর ঠিক তাই ঘটছে। তফাৎ শুধু এইটুকু যে, ইহুদি জাতির ওপর ঐ Pogrom ইউরোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল আর আমাদের ওপর Pogrom হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীময়। এক কোটির ছোট্ট ইহুদি জাতি আজ আমাদের একশ' ষাট কোটির এই জাতির ওপর Pogrom করছে। অভিশপ্ত অর্থাৎ মালাউন হবার যে সব চিহ্ন ইহুদি জাতির গায়ে লেখা হয়েছিল সে সব চিহ্ন আজ এই জাতির গায়ে লেখা। সারা শরীরে আল্লাহর অভিশাপের ছাপ নিয়ে যে নামাজ, রোজা এবং আরও হাজার রকমের ইবাদত করা হচ্ছে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হচ্ছে মনে করে আমরা আহাম্মকের স্বর্গে বাস করছি।

মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদী বলে পরিচিত এই জাতিটি আকিদার বিকৃতিতে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দেখানো দিক নির্দেশনা, হেদায়াতের ঠিক বিপরীত দিকে চলার ফলে আল্লাহর চোখে এটা আর মো'মেনও নেই, মুসলিমও নেই, উম্মতে মোহাম্মদীও নেই। এই জাতি এখন আল্লাহর লা'নতের ও গযবের বস্তু, এর অবস্থা এখন অতীতের অভিশপ্ত ইহুদি জাতির চেয়েও নিকৃষ্ট। আল্লাহর রসুলের গঠন করা জাতিটির প্রথম একশ' বছরের অবস্থার সাথে বর্তমান অবস্থার একটা তুলনা এ কথা প্রমাণ করবে।

আল্লাহর রসুলের প্রকৃত ইসলাম ও মুসলিম জাতি	**বর্তমানের বিকৃত ইসলাম ও এই জাতি**
১। সংখ্যায় পাঁচ লাখের মতো।	১। সংখ্যায় একশ' ষাট কোটি।
২। জাতির প্রাকৃতিক সম্পদ- শূন্য - কিছুই ছিল না।	২। পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের এক বিরাট অংশের মালিক। যে তেল ও গ্যাস ছাড়া বর্তমান ইহুদি খ্রিষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতা অচল, সেই তেলের শতকরা ৬০ ভাগ এবং গ্যাসের একটা বিরাট অংশ এই জাতির হাতে। এ ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের এক প্রধান অংশের মালিক।

৩। ঐ পাঁচ লাখের জাতির মধ্যে মাত্র ৪০ জনের মতো লোক লেখা পড়া জানতেন।	৩। বর্তমানে এই জাতির মধ্যে কোটি কোটি লোক লেখা পড়া জানে, লক্ষ লক্ষ লোক উচ্চ শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, আইনজ্ঞ, বিজ্ঞানী, শিল্পী এবং লক্ষ লক্ষ মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, হাফেজে কোর'আন, ফকিহ, মোহাদ্দেস, আলেম ওলামা, পীর-মাশায়েখ ইত্যাদি সবই আছে।
৪। ঐ জাতির কাছে আল্লাহর দেয়া সংবিধান কোর'আনের মাত্র কয়েকটি হাতে লেখা কপি ছিল, তাও খলিফা ওসমানের (রা.) সময়ের পরে।	৪। বর্তমানে এই জাতির কাছে কোর'আনের কোটি কোটি কপি পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান। একমাত্র বাইবেলের সংখ্যার সাথে কোর'আনের সংখ্যার তুলনা করা যায়, এমন কি অনেকের মতে বাইবেলের চেয়েও বেশী।
৫। কোর'আনের কোনো অনুবাদ ছিল না।	৫। বর্তমানে পৃথিবীর প্রত্যেক প্রধান ভাষায় কোর'আনের একাধিক অনুবাদ হয়ে গেছে। এমন কি অনেক আঞ্চলিক ভাষায়ও এর অনুবাদ হয়ে গেছে।
৬। অর্ধেক বিশ্বজয়ী ঐ জাতির বহু মানুষ বই আকারে কোর'আনকে কোনদিন চোখেই দেখেন নি। তাদের মধ্যে যার যেটুকু মুখস্থ ছিল তারা সেইটুকুই জানতেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতেন।	৬। বর্তমানে ঝকঝকে হরফে ছাপানো অতি সুন্দর কোর'আন পৃথিবীতে কোটি কোটি সংখ্যায় বর্তমান। লক্ষ লক্ষ মানুষের ঐ বিরাট কোর'আন মুখস্থ।
৭। কোর'আনের লিখিত কোনো ব্যাখ্যা অর্থাৎ তাফসির ছিল না।	৭। বর্তমানে কোর'আনের শত শত তাফসির ও হাজার হাজার ব্যাখ্যাকারী অর্থাৎ মোফাসসের আছেন।
৮। ঐ জাতি ইস্পাতের মতো ঐক্যবদ্ধ ছিল।	৮। বর্তমানের এই জাতিটি রাজনৈতিকভাবে পঞ্চান্নটির মতো ভৌগলিক রাষ্ট্রে, দীনের ব্যাখ্যায় বহু মযহাবে ও ফেরকায়, আধ্যাত্মিকভাবে শত শত তরিকায় এবং ইহুদি খ্রিষ্টানদের নকল করে হাজার হাজার রাজনৈতিক দলে ছিন্নবিচ্ছিন্ন।

৯। তদানিন্তন সভ্য পৃথিবী থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন, রোমান এবং পারসিক বিশ্বশক্তির নাম শুনলে ভয়ে কম্পমান আরব জাতিকে সেই ইসলাম মাত্র দশ বছরের মধ্যে এমন দুর্ধর্ষ যোদ্ধায় রূপান্তরিত করেছিল যে ঐ মহাশক্তিধর রোমান এবং পারসিকরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সামনে ঝড়ের মুখে তুলোর মতো উড়ে গিয়েছিল; একবার নয়, বহুবার। যে আরবদের তারা মাত্র কয়েক বছর আগেই অবজ্ঞা করতো, পরে তাদের নাম শুনলেই তারা ভয়ে কাঁপত।	৯। বর্তমান ইসলাম এমন জাতি সৃষ্টি করে এবং করছে যারা পৃথিবীতে ১৬০ কোটি হওয়া সত্ত্বেও শুধু সেই খ্রিষ্টানরা নয়, পৃথিবীর সমস্ত জাতিগুলির অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্র এবং সে অবজ্ঞা ও ঘৃণা বোঝার শক্তিও এ জাতির নেই। অন্যান্য জাতিগুলোর বিরুদ্ধতা করার শক্তিও নেই। কখনও করলে পরাজয় ও অপমান অবধারিত।
১০। বিশ্বনবী মোহাম্মদের (দ.) নেতৃত্বে সেই ইসলাম দশ বছরের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল খালেদ বিন ওয়ালিদের (রা.) মতো আল্লাহর তলোয়ার, আলী বিন আবু তালিবের (রা.) মতো আল্লাহর সিংহ এবং দেরারের (রা.) মতো বহু অপরাজেয় দুর্ধর্ষ যোদ্ধা।	১০. বর্তমানের এই ইসলাম ১৬০ কোটির জাতির মধ্য থেকে প্রায় দেড় হাজার বছরেও একটি মাত্র খালেদ একটি আলী বা একটিও দেরার (রা.) সৃষ্টি করতে পারে নাই।
১১। আল্লাহর- রসুলের সেই ইসলাম অতি শান্ত মেজাজের, সুফী চরিত্রের আবু ওবায়দা (রা.) কে এমন অজেয় যোদ্ধা ও অপরাজেয় সেনাপতিতে রূপান্তরিত করেছিল যে তার নেতৃত্বে সেই উম্মাহ সমস্ত উত্তর সিরিয়া জয় করে আল্লাহর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। শুধু সেনাপতি হিসাবে নয়, একক দ্বন্দ্বযুদ্ধে অর্থাৎ Single combat-এ ঐ স্বল্পভাষী শান্ত মানুষটি রোমান এবং পারসিকদের প্রখ্যাত যোদ্ধাদের পরাজিত ও ধরাশায়ী করেছেন।	১১। আর আজ ধর্ম সম্মন্ধে বেখেয়াল, বেপরোয়া কিন্তু সাহসী ও দাপটওয়ালা কোনো মানুষকে যদি বর্তমানের ইসলামের ধার্মিক বানানো যায় তবে ঐ লোকটি অচিরেই একটি নিরীহ গো-বেচারা কাপুরুষে পরিণত হয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ-রাসুলের সেই প্রকৃত ইসলাম একটি শিয়ালকে সিংহে রূপান্তরিত করে আর আমাদের বর্তমানের এই ইসলাম সিংহকে শিয়ালে পরিণত করে।
১২। আল্লাহর রসুলের ইসলাম নির্জনবাসি কামেল সুফী সাধক ওয়ায়েস করনি (রা.) কে নির্জনবাস থেকে বের করে এনে তলোয়ার হাতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে শহীদ করেছিল।	১২। আর বর্তমানের এই ইসলাম যোদ্ধার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তার হাতে তসবীহ ধরিয়ে দিয়ে মসজিদে আর খানকায় বসিয়ে দেয়।

১৩। আল্লাহর রসুলের ইসলাম সম্পূর্ণ উম্মতে মোহাম্মদীকে আল্লাহর দীন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র হাতে তাদের স্বদেশ থেকে এমন ভাবে বের করে দিয়েছিল যে তাদের শতকরা আশি জনের কবর হয়েছে বিদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে।	১৩। বর্তমানের ইসলাম এমন জাতি তৈরি করে এবং করছে যারা তসবীহ হাতে মসজিদে, খানকায় বসে থাকে এবং কোনো রকম বিপদের আভাষ পেলেই হাওয়ার বেগে ইঁদুরের মতো গর্তে লুকিয়ে যায়। এ সম্বন্ধে বিগত '৯০ দশকের একটি ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না। কাশ্মিরে মোজাহেদদের পাতা মাইন ফেটে কয়েকটি ভারতীয় সৈন্য আহত হওয়ায় তারা রেগে গিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। কিছু দূরেই একটি মসজিদ ছিল এবং সেখানে নামাযের জন্য বর্তমান ইসলামের মুসল্লীরা সমবেত হয়েছিলেন। গুলির শব্দে ঐ মুসল্লীরা প্রাণের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে দৌঁড়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে পালাতে যেয়ে নয় জন এক কুয়োর মধ্যে পড়ে যান। পাঁচজন ঐখানেই মারা যান এবং চার জনের খবর জানা যায় নাই। খবরটা এদেশের সব দৈনিকেই বের হয়েছিল - আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি ১০ই সেপ্টেম্বরের New-nation (১৯৯৪) থেকে। মৃত্যু ভয়ে কতখানি দিশাহারা হলে মানুষ অমন ঘৃণিতভাবে মরতে পারে। [এমন লজ্জার ঘটনা শুধু যে ঐ কাশ্মিরেই ঘোটেছে তা নয়, অনুরূপ অবস্থায় পৃথিবীর যে কোনো মসজিদে কাপুরুষতার ঐ রকম ঘটনাই ঘটবে। সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশেও এরকমই একটি ঘটনা ঘটেছে। আল্লাহ ও রসুলের অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করতে গিয়ে পুলিশের ধাওয়া খেয়ে হাজার হাজার মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক ইমাম সাহেবরা এমনভাবে পালিয়েছেন যে পালাতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে কয়েকজন ঝাঁপ দিয়েছেন পদ্মানদীতে। এর তিনদিন পরে এক মাদ্রাসা ছাত্রের লাশ নদী থেকে উদ্ধার করা হয় (২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৩- দৈনিক ইত্তেফাক)। মৃত্যুভয়ে কতখানি দিশাহারা হলে মানুষ অমন ঘৃণিতভাবে মরতে পারে। এমন লজ্জার ঘটনা শুধু যে ঐ কাশ্মিরেই ঘটেছে তা নয়, অনুরূপ অবস্থায় পৃথিবীর যে কোনো মসজিদে কাপুরুষতার ঐ রকম ঘটনাই ঘটবে।]

১৪। আল্লাহর রসুলের ইসলাম যে জাতি গঠন করেছিল সে জাতির চরিত্রের সর্ব প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যোদ্ধার চরিত্র, তার প্রমাণ জাতির নেতা আল্লাহর রসুল (দ.) সহ সমস্ত জাতির মধ্যে এমন একটা লোকও বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যেতনা যার শরীরে অস্ত্রের আঘাত নেই।	১৪। বর্তমানের ইসলাম যে জাতি গঠন করে তার চরিত্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কাপুরুষতা। ছোট বড় সমস্ত রকম সংঘর্ষ, বিপদ আপদ থেকে পলায়ন। যে যতো বেশী ধার্মিক সে তত বেশী কাপুরুষ; অস্ত্রের আঘাত তো দূরের কথা, এদের গায়ে সুচের খোঁচারও দাগ নেই।
১৫। আল্লাহর রসুলের ইসলাম তাঁর জাতির মধ্যে যে নারী সৃষ্টি করেছিল তাদের মায়েরা নিজেদের ছেলেদের যুদ্ধের পোষাক পরিয়ে মাথায় শিরস্ত্রাণ, কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে দিয়ে হাত তুলে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমার ছেলে যেন যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে না আসে। তুমি তার শাহাদাত কবুল কর।	১৫। বর্তমানের ইসলামে যুদ্ধতো নেই-ই, যদি ব্যতিক্রম হিসাবে কোনো ছেলে জেহাদের জন্য মায়ের অনুমতি চায় তবে তার মা চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যান।
১৬। আল্লাহর রসুলের ইসলামের মেয়েরা রসুলাল্লাহর (দ.) পাশে দাঁড়িয়ে তলোয়ার ও তীর ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করেছেন এবং রসুল (দ.) দুনিয়া থেকে চলে যাবার পর অস্ত্র ও তাবুর খুঁটি দিয়ে পিটিয়ে খ্রিষ্টানদের শিক্ষিত যোদ্ধাদের পরাজিত করেছেন।	১৬। বর্তমানে ইসলামের ধার্মিক মেয়েদের তাদের বাক্সবন্দী অবস্থা থেকে বের করে চৌরাস্তার মোড়ে ছেড়ে দিয়ে আসলে তারা ওখান থেকে আর বাড়ি ফিরতে পারেন না, ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকেন।
১৭। আল্লাহর রসুলের ইসলাম এতটাই সহজ সরল ছিল যে পশ্চাদপদ, নিরক্ষর, বাকি দুনিয়া সম্পর্কে অজ্ঞ আরবদেরও বুঝতে কোনো অসুবিধা হতো না।	১৭। বর্তমানের ইসলাম এতই জটিল একটি বিষয় যা বুঝতে হলে জীবনের বড় একটি অংশ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করতে হয়, যার সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান হাসিল করা এবং মেনে চলা কোনো মানুষের একজীবনে সম্ভব নয়।
১৮। ইসলামের আনীত সামরিক কুচকাওয়াজ সালাহ'র অপরূপ সৌন্দর্য্য বহু বিধর্মীকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। সেই সালাহ জাতিকে শিক্ষা দিয়েছিল ইস্পাতের মতো ঐক্য, পিঁপড়ার মতো শৃঙ্খলা, মালায়েকের মতো আনুগত্য, কঠিন সময়ানুবর্তিতা, আল্লাহ যা কিছু নিষেধ করেছেন তার থেকে এবং শেরক ও কুফর থেকে হেজরত করার মতো চরিত্র সৃষ্টি করেছিল।	১৮। পক্ষান্তরে বর্তমানের মসজিদগুলিতে মুসল্লীরা মাথার সামনে নোংরা জুতা রেখে সালাহ করেন যেন অপর কোনো মুসল্লি সেগুলি চুরি না করতে পারে। সমাজের বহু দুর্নীতিবাজ ও নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি রয়েছেন যাদের কপালে সেজদা করতে করতে কড়া পড়ে গেছে। বর্তমান ইসলামের সালাহ তাদেরকে অন্যায় করা থেকে বিরত রাখতে পারে নি।

১৯। প্রকৃত ইসলামে যাকাত ছিল একটি জাতীয় খাত। জাতীয়ভাবে ধনীদের থেকে যাকাত আদায় করা হতো এবং প্রাপ্যদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। ইসলামের অর্থনীতি বাস্তবায়নের ফলে একটা সময় পরে এসে সমাজে এমন স্বচ্ছলতা এসেছিল যে সদকা এবং যাকাতের অর্থ নেওয়ার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যেত না।	১৯। বর্তমানের ইসলামে যাকাত একটি ব্যক্তিগত দানের বিষয়। ধনী লোকেরা লোক দেখানোর জন্য যাকাতের কাপড় ইত্যাদি বিতরণ করে এবং সেই যাকাত নিতে এসে পায়ের তলে পিষ্ট হয়ে মারা যায় বহু হত দরিদ্র মানুষ।
২০। আল্লাহ ও রসুল (দ.) হজের মাধ্যমে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন পৃথিবীময় ছড়িয়ে থাকা মুসলিম জাতির প্রতিনিধিরা বছরে একবার মক্কায় এবং আরাফাতের ময়দানে একত্র হয়ে তাদের জাতীয় সমস্যা পর্যালোচনা করবে, পরামর্শ করবে, সিদ্ধান্ত নেবে, উম্মতে মোহম্মদীর উপর আল্লাহ ও তার রসুলের (দ.) যে মহাদায়িত্ব অর্পিত আছে তা কতদূর অগ্রসর হলো, এখন কি কি বাধা আসছে এবং কেমন করে সে সব অতিক্রম করতে হবে সে সম্বন্ধে পরামর্শ করে ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির করবে। অর্থাৎ হজ হচ্ছে বিশ্ব-মুসলিমের বার্ষিক মহা সম্মেলন।	২০। বর্তমানের বিকৃত আকিদার মুসলিমরা, মহা আবেদরা আত্মার উন্নতির জন্য হজ করতে যান। চুপচাপ যান, চুপচাপ ফিরে আসেন। অন্যের সমস্যা, অন্যের বিপদে তাদের কী আসে যায়? বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অন্যান্য জাতি দ্বারা মুসলিমরা লাঞ্ছিত হচ্ছে হোক, মরছে মরুক, বাড়ি ঘর ছাড়া হচ্ছে হোক, না খেয়ে মরছে মরুক, হাজার হাজার মুসলিম মেয়েরা ধর্ষিতা হয়ে গর্ভবতী হচ্ছে, হোক, তাতে হাজীদের কী আসে যায়? তাদের আত্মার ধোয়ামোছা হলেই হলো। অথচ বিশ্বনবী (দ,) বলেছেন- এই জাতিটি একটি শরীরের মত, এর কোথাও ব্যথা হলে তা সমস্ত শরীরকে অসুস্থ করে [বুখারী, মুসলীম, মেশকাত]। অর্থাৎ পৃথিবীময় ছড়িয়ে থাকা এই উম্মাহর যে কোনো স্থানে আঘাত লাগলে তা সমস্ত শরীরে অনুভূত হয়। এই জাতির পিতা এই জাতির যে সংজ্ঞা দিলেন সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী আজকের হাজীরা কি তাঁর উম্মতের হাজী? এদের হজের উদ্দেশ্য যেন কেবল নামের আগে 'আলহাজ' উপাধি সংযোজন করা।
২১। মসজিদ ছিল উম্মাহর প্রাণকেন্দ্র। সালাহ কায়েম করা ছাড়াও মসজিদ থেকেই প্রেরিত হতো সেনাবাহিনী, মসজিদেই খলিফার সাক্ষাৎ করতেন বিভিন্ন রাষ্ট্রের দূতগণ, জুমার দিনে মসজিদেই বসতো আদালত, সাজা দেওয়া হতো	২১। বর্তমানের মসজিদে নামাজ পড়া ছাড়া আর কোনো কাজ করা নিষেধ, এমন কি অনেক মসজিদে লেখা থাকে 'মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা হারাম'। বর্তমানে মসজিদে মেয়েদের বলতে গেলে কোনো প্রবেশাধিকারই নেই। বর্তমানের

অপরাধীদের। প্রতি ওয়াক্তে নারী ও পুরুষ সকলেই সালাতে অংশ নিত। মসজিদ ছিল প্রাণবন্ত, জীবন্ত।	মসজিদগুলি নিষ্প্রাণ, অধিকাংশ সময়েই গেটে তালা ঝুলানো থাকে।

সমবেত সুধীমণ্ডলী। আল্লাহর রসুল চৌদ্দশ' বছর আগে ইসলামের যে শেষ সংস্করণটি মানবজাতিকে উপহার দিয়েছিলেন সেটি এবং বর্তমানে আমরা যে ইসলাম বলে পরিচিত দীনটি পালন করছি এই দুইটি যে শুধু ভিন্ন নয়, একেবারে বিপরীতমুখী দু'টি পথ তা দেখাতে সংক্ষেপে মাত্র ২২টি প্রমাণ উপস্থাপিত করলাম। এ লিস্টটি আরও অনেক বড় করা যায়, তা আর করলাম না। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহর অবতীর্ণ ইসলামের চরিত্র হচ্ছে বহির্মুখী অর্থাৎ Extrovert এবং বিস্ফোরণমুখী অর্থাৎ Explosive এবং বর্তমানে আমাদের ইসলাম বিকৃত হয়ে- হয়ে গেছে অন্তর্মুখী, Introvert এবং সংকোচনশীল অর্থাৎ Implosive। বিকৃত এবং বিপরীতমুখী এই ইসলামকেই আমরা সঠিক ইসলাম মনে করে যথাসাধ্য তা পালন করার চেষ্টা করছি। এই এত বড় ভুল, এত বড় গোমরাহীর কারণ কি? এর কয়েকটি কারণ আছে। সর্বপ্রধান কারণ হচ্ছে আকিদার বিকৃতি ও লোপ। এখানে আকিদা নিয়ে আলোচনায় যাব না কারণ হেযবুত তওহীদ থেকে প্রকাশিত 'মোমেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদীর প্রকৃত আকিদা' নামের ছোট্ট বইটিতে আকিদা সম্বন্ধে মোটামুটি লেখা হয়েছে। এখানে শুধু এইটুকু বলবো যে আকিদার বিকৃতিতে এই দীন সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করে ইবলিসের চ্যালেঞ্জে আল্লাহকে জয়ী করার সংগ্রাম, জেহাদ ত্যাগ করে রাজত্ব করা আরম্ভ করায় আল্লাহ ঐ জাতির অভিভাবকত্ব ত্যাগ করলেন এবং কোর'আনের সুরা তওবার ৩৯ নং আয়াতে তাঁর সাবধানবাণী ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজত্ব ও রাষ্ট্রশক্তি ঐ জাতির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন খ্রিষ্টান জাতিগুলির হাতে তুলে দিলেন এবং মুসলিম বলে পরিচিত ঐ জাতিটিকে তাদের দাস, গোলাম বানিয়ে দিলেন।

এখানে একথা উপলব্ধি করতে হবে যে যখন মো'মেন মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদী বলে পরিচিত ঐ জাতিটিকে আল্লাহ খ্রিষ্টানদের দিয়ে সামরিকভাবে পরাজিত করে দিলেন তখন স্বভাবতঃই ঐ জাতি আর প্রকৃতপক্ষে মো'মেন, মুসলিম বা উম্মতে মোহাম্মদী এর কোনটাই রইলো না। কারণ কোর'আনে আল্লাহ একাধিকবার পরিষ্কার বলেছেন যে, সামরিক সংঘর্ষে মো'মেন জাতিকে কখনই তিনি শত্রুর হাতে পরাজিত হতে দেবেন না, এটা তাঁর সুন্নাহ, তাঁর চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় সুন্নাহ (সুরা ফাতাহ ২২ এবং ২৩ নং আয়াত)। আল্লাহর রসুলও বলে গেছেন যে, আল্লাহর কাছ থেকে তিনি প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন যে তাঁর উম্মাহ কখনও শত্রুর কাছে সামরিকভাবে পরাজিত হবে না [সাওবান ও খাব্বাব (রা.) থেকে মুসলিম, তিরমিযি ও নাসায়ী]। খ্রিষ্টানদের হাতে সামরিক পরাজয়ই প্রমাণ করে দিলো যে আল্লাহর চোখে ঐ জাতি, জাতি হিসাবে মো'মেন রইলো না এবং মো'মেন রইলো না অর্থই মুসলিমও রইল না, উম্মতে মোহাম্মদীও রইল না।

ঐ জাতিকে দাসে পরিণত করার পরও খ্রিষ্টান জাতিগুলির মনে ঐ দাস জাতির সম্বন্ধে ভয় সম্পূর্ণ দূর হলো না, কারণ তখনও তাদের মন থেকে সেই ইতিহাস সম্পূর্ণ মুছে যায়

নি যে, অতীতে ঐ জাতির হাতে কতবার তারা সামরিকভাবে পরাজিত হয়েছিল। তারা জানতো, যে জাতিকে তারা এখন পরাজিত ও পদানত করেছে সে জাতির প্রচণ্ড শক্তির উৎস হচ্ছে তাদের কোর'আন ও হাদীস। এই কোর'আন ও হাদীস এবং তাদের নবীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণই তাদের এক অপরাজেয় দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিতে রূপান্তরিত করেছিল যারা একদিন ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিতাড়িত তো করেছিলই, শুধু তাই নয় তাদের ইউরোপের মধ্যেও অর্ধেক ঢুকে পড়েছিল। তাই এই জাতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিত হবার জন্য, এই জাতিটিকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দেবার জন্য তারা এক শয়তানি ফন্দি আট্‌লো। সে ফন্দি হলো এই যে, সমস্ত মুসলিম দুনিয়ায় খ্রিষ্টানেরা যার যার অধিকৃত অংশে মুসলিমদের "ইসলাম" শিক্ষা দেবার জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলো। ইংরেজরা এই উপমহাদেশে, মালয়েশিয়ায়, মিশরে ইত্যাদিতে; ফরাসিরা আলজেরিয়া এবং অন্যান্য যে সব মুসলিম এলাকা দখল করেছিল সেখানে; ডাচ অর্থাৎ ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়ায় ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন করলো। ইংরাজ অধিকৃত এই উপমহাদেশের বড়লাট অর্থাৎ Viceroy মি. ওয়ারেন হেসটিংস ১৭৮০ সনে কলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলেন। এই মাদ্রাসায় "ইসলাম" শিক্ষা দেবার জন্য খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা, যাদের ইংরাজিতে বলা হয় Orientalists, সম্মিলিতভাবে বহু গবেষণা করে একটি নতুন "ইসলাম" দাঁড় করালেন, যে "ইসলামের" বাহ্যিক দৃশ্য ইসলামের মতই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যেটার আকিদা এবং চলার পথ অর্থাৎ সেরাত, আল্লাহর রসুলের ইসলামের, সেরাতুল মুস্তাকিমের ঠিক বিপরীত। ঐ বিপরীতমুখী ইসলাম শিক্ষা দিতে কি কি বিষয় শিক্ষা দিতে হবে, কি কি বিষয়বস্তু বাদ দিতে হবে, কেমন করে শিক্ষা দিতে হবে অর্থাৎ এক কথায় Syllabus এবং Carricullam নির্ধারণ ও স্থির করলেনঐ খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা। ঐ Syllabus ও Carricullam এ আল্লাহর সর্বব্যাপী তওহীদকে সংকুচিত করে ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ করা হলো, কারণ সার্বভৌমত্ব তো ব্রিটিশের, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব শিক্ষা দিলে তো তাদের রাজত্ব করাই বিপজ্জনক। তারপর আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ তওহীদের ঠিক পরেই যে জেহাদের স্থান সেই জেহাদকে ঐ মাদ্রাসার পাঠ্যবস্তুতে অতি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিণত করে প্রায় বাদ দেওয়া হলো। সমষ্টিগত, জাতিগত বিষয়গুলিকে নিম্নস্তরে নামিয়ে দিয়ে অতি সাধারণ ব্যক্তিগত বিষয়গুলিকে অতি গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়া হলো। নামাজ, রোজা, বিয়ে-শাদী, বিবি তালাক, দাড়ি-টুপি, পাজামা, পাগড়ী, মেসওয়াক, কুলুখ, ওজু গোসল, হায়েয-নেফাস ইত্যাদি হাজার রকমের বিষয়গুলিকে ইসলামের অতি জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে উপরে স্থান দেয়া হলো। ঐ সিলেবাসে (Syllabus) আরও প্রাধান্য দেয়া হলো সেই সব বিষয়গুলিকে যেগুলি সম্বন্ধে দুর্ভাগ্যক্রমে বিভিন্ন মাযহাবে ও ফেরকায় মতভেদ ও বিতর্ক আগে থেকেই মওজুদ ছিল ও আছে। খ্রিষ্টান পন্ডিতেরা এটা করলেন এই জন্য যে তাদের শেখানো ইসলামের আলেমরা যেন ঐগুলি নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি, বাহাস ও প্রয়োজনে মারামারি করতে থাকে, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে এবং তাদের শাসন নিরাপদ হয়। এই দাস জাতির আরেকটি অংশ, যেটি আল্লাহর সান্নিধ্যলাভের জন্য তাসাওয়াফ নিয়ে ব্যস্ত ছিল তাদের সম্বন্ধে ব্রিটিশ খ্রিষ্টানদের কোনো দুঃশ্চিন্তা ছিল না। কারণ তারা জানতো ঐ অংশটি তসবিহ হাতে খানকায়, হুজরায় আর মসজিদের চার দেয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ আছে; সমাজ, রাষ্ট্র ব্যবস্থা আল্লাহর আইন

মোতাবেক চলছে, না খ্রিষ্টান বা হিন্দু বা ইহুদিদের আইনে চলছে সে ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। শুধু ঐটুকু করেই ইংরেজরা ক্ষান্ত হলো না। আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে তাদের সৃষ্ট "ইসলাম" শিক্ষা দিতে কোথাও কোনো বাধা না আসতে পারে সে জন্য মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য পূর্ণ ক্ষমতাসহ অধ্যক্ষ পদটি তারা নিজেদের হাতেই রাখলো। প্রথম অধ্যক্ষপদে নিয়োজিত হলেন Dr. A. Springer M.A। ১৭৮০ থেকে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত এই ১৪৬ বছর একাধিক্রমে ২৬ জন খ্রিষ্টান পণ্ডিত আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষপদে থেকে এই জাতিকে "ইসলাম" শিখিয়েছেন। তারা কোন "ইসলাম" শিখিয়েছেন? অবশ্যই তারা আল্লাহ রসুলের সেই প্রকৃত ইসলাম সেখান নাই, যে ইসলামের সৃষ্ট দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের হাতে তারা বার বার পরাজিত হয়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকে পালিয়ে যেয়েও নিস্তার পান নাই, যে যোদ্ধারা তাদের তাড়া করে ইউরোপের মধ্যে অর্ধেক ঢুকে পড়েছিল। খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা তাদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলিতে শিখিয়েছেন তাদের তৈরি করা এমন একটি ইসলাম যেটা তৈরি করে মৃত্যুভয়ে ভীত কাপুরুষ, যারা দাড়ি, মোচ, টুপি, পাগড়ি, মেসওয়াক, কুলুখ, হায়েয-নেফাস, যিকির আসকার আর বিবি তালাককেই ইসলাম মনে করে তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে বাহাস আর মারামারি করতে থাকে যাতে খ্রিষ্টানরা নিশ্চিন্ত মনে তাদের দাসদের ওপরে রাজত্ব করতে পারে। ১৪৬ বছর ধরে নিজেদের তৈরি "ইসলাম" শেখাবার পর ২৬ নং খ্রিষ্টান অধ্যক্ষ Mr. Alexander Hamilton Harty ১৯২৭ সনে অধ্যক্ষপদ শামসুল ওলামা, কামাল উদ্দিন আহমদ এম.এ.আই.আই.এস এর হাতে ছেড়ে দেন। [দেখুন- আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, মূল- আ. সাত্তার, অনুবাদ- মোস্তফা হারুণ, ইসলামী ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ এবং Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal by Dr. Sekander Ali Ibrahimy (Islami Foundation Bangladesh)]।

আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতিতে নিজেদের সাফল্য দেখে ব্রিটিশরা এই উপমহাদেশসহ তাদের অধিকৃত অন্যান্য মুসলিম দেশগুলিতেও আলীয়া মাদ্রাসার অনুকরণে শত শত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে ও তাদের তৈরি "ইসলাম" শিক্ষা দেয়। ইংরাজ চলে গেছে কিন্তু তাদের তৈরি করা "ইসলাম" আজও আমাদের মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, ঐ মাদ্রাসাগুলি থেকেই ঐ ইসলাম শিখে আলেমরা বের হয়ে আসছেন ও আমাদের ঐ "ইসলাম"ই শিক্ষা দিচ্ছেন। আমরা আজ ইসলাম বলতে সেই ইসলামই বুঝি যে "ইসলাম" খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা তৈরি করে ১৪৬ বছর ধরে আমাদের শিক্ষা দিয়েছে। ফলে আজ আমাদের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক জীবন পরিচালিত হচ্ছে পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টানদের তৈরি করা নানা রকম তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে আর ব্যক্তিগত ধর্মীয় জীবন পরিচালিত হচ্ছে খ্রিষ্টান পণ্ডিতদের তৈরি করা "ইসলাম" দিয়ে, আল্লাহ রসুলের ইসলাম দিয়ে নয়। ভাবতে অবাক লাগে এর পরও আমরা নিজেদের মো'মেন, মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদী বলে বিশ্বাস করি এবং পরকালে আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাতের আশা করি।

সমবেত সুধীগণ! আল্লাহ তাঁর অসীম রহমতে আমাদের জন্য কোন ইসলাম তাঁর শ্রেষ্ঠ রসুল দিয়ে এনায়েত করছেন, কোন ইসলাম তিনি কবুল করবেন তা আমাদের এই হেযবুত তওহীদকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সম্পূর্ণ দিয়েছেন কিনা জানি না তবে যেটুকু দিয়েছেন তাই-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এই হেযবুত তওহীদ থেকে আমরা মানুষকে ডাকছি সেই প্রকৃত

ইসলামের দিকে- যে ইসলামের ভিত্তি তওহীদ, সর্বব্যাপী তওহীদ, যার স্তম্ভ, থাম সালাহ (নামাজ) এবং যার ছাদ জেহাদ [হাদীস– মুয়ায (রা.) থেকে আহমদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, মেশকাত)]। সেই সঙ্গে আমরা জোর দিয়ে বলে যাচ্ছি, বর্তমানের হাজারো ফেরকা মাজহাবে বিভক্ত মুসলমান বলে পরিচিত এই জনগোষ্ঠীকে যদি চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতে হয়, তাহলে তাদেরকে দুটো কাজ অবশ্যই করতে হবে- (এক) তওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং (দুই) তওহীদের উপর ভিত্তি করা আল্লাহর দেওয়া সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করা। এখানে তওহীদ অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব তথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। বর্তমানে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র অর্থ করা হয় আল্লাহ ছাড়া কোনো মা’বুদ (উপাস্য) নেই। সে মোতাবেক আমরা আল্লাহর উপাসনা করা, নামাজ রোজাসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পালন করে থাকি। কিন্তু না। কালেমার এ দাবি কেবল উপাসনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, পারিবারিক, সামাজিক থেকে শুরু করে জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামরিক, বাণিজ্যিক, বিচারিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম বিধান না মানাই হচ্ছে কলেমা তওহীদের দাবি। কারণ এ কলেমায় আল্লাহ মানবজাতির একমাত্র ইলাহ হিসাবে স্বীকৃতি চেয়েছেন, যার অর্থ হচ্ছে হুকুমদাতা, বিধানদাতা। তাহলে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র অর্থ হলো জীবনের সকল অঙ্গনে (ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করব না- এই অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকা। এজন্য মুসলমান জনগোষ্ঠীকে প্রথমে কলেমার সঠিক অর্থ উপলব্ধি করে তার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, তওহীদে ঐক্যবদ্ধ হবার পর মো’মেনদের প্রধান কাজ হবে আল্লাহর দীনকে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা। কেননা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা না হলে রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর বিধান কার্যকর করা কখনই সম্ভব নয়। সেজন্য পবিত্র কোর’আনে আল্লাহ বলেছেন, তোমরা আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করো এবং এ বিষয়ে কোনো প্রকার মতভেদ করো না (সুরা শুরা ১৩)। অন্যত্র বলেছেন, তিনি তাঁর রসুলকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন মানুষের তৈরি সকল জীবনব্যবস্থা বা দীনের উপর আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য (সুরা তওবা ৩৩, সুরা ফাতাহ ২৮, সুরা সফ ৯)। অর্থাৎ রসুল (সা.) ও তাঁর উম্মাহর জন্য দীন প্রতিষ্ঠা করা ফরজ (বাধ্যতামূলক)।

প্রশ্ন হলো- দীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি কী হবে? এতবড় কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্ব আল্লাহ মো’মেনদেরকে দিলেন, অথচ সেই দায়িত্ব মো’মেনরা কীভাবে সম্পাদন করবেন, দীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি কী হবে- সেটা কি তিনি বলে দিবেন না? অবশ্যই বলে দিবেন এবং আল্লাহ তাঁর রসুলের মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠার পাঁচ দফা কর্মসূচিও দান করেছেন। রসুল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ আমাকে পাঁচটি কাজের আদেশ দিয়েছেন, আমিও তোমাদেরকে সেই পাঁচটি কাজের আদেশ দিয়ে যাচ্ছি। সেগুলো হচ্ছে- ঐক্যবদ্ধ হওয়া, নেতার আদেশ শোনা, নেতার আদেশ পালন করা, হিজরত করা এবং জেহাদ করা। যারা এই কর্মসূচির ঐক্যবন্ধনী থেকে আধহাতও সরে যাবে, তাদের গলদেশ থেকে ইসলামের রজ্জু খুলে যাবে। আর যারা জাহেলিয়াতের কোনো কিছুর দিকে আহ্বান করবে, তারা নামাজ পড়লেও, রোজা রাখলেও, নিজেদেরকে মো’মেন মুসলিম বলে বিশ্বাস করলেও জাহান্নামের জ্বালানি

পাথরে পরিণত হবে [হাদিস- আল হারিস আল আশয়ারী (রা.) থেকে আহমদ, তিরমিযি, বাব উল এমারাত, মেশকাত]।

অতি সংক্ষেপে বিষয়টি হচ্ছে- তওহীদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই কর্মসূচি অনুসরণ করে মো'মেনরা একজন নেতার হাতে বায়াত নিয়ে ঐ নেতার আদেশ শুনবে ও অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে, হিজরত করবে এবং আপ্রাণ জেহাদ চালিয়ে যাবে। সেই জেহাদের ফলে দীন প্রতিষ্ঠা হবে। দীন প্রতিষ্ঠা হলেই মানবজীবনে শান্তি আসবে। এটাই ইসলামের লক্ষ্য। এই পাঁচ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য মো'মেনের যে চরিত্র দরকার, সেই চরিত্র হাসিলের জন্য সালাহ, সওম ইত্যাদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কাজেই উম্মতে মোহাম্মদী হবে এক অখণ্ড জাতি, তাদের আদর্শ হবে একটি, লক্ষ্য হবে একটি, কর্মসূচি হবে একটি, নেতা হবেন একজন। হেযবুত তওহীদ সেই অখণ্ড উম্মতে মোহাম্মদী জাতি গঠনের লক্ষ্যেই ডাক দিয়ে যাচ্ছে।

আমরা আপনাদের আহ্বান করছি- আপনারা শুনুন আমরা কী বলি, আমাদের আকিদা কী, আমাদের ঈমান কী, আমাদের আমল কী- তারপর সিদ্ধান্ত নিন। হেদায়াহ অর্থাৎ দিক নির্দেশনা আমাদের হাতে নেই, ওটা আল্লাহর নবীদের হাতেও ছিল না। হেদায়াহ একমাত্র আল্লাহর হাতে। আমরা শুধু ডাকতে পারি। তাই আমরা ডাকছি, আহ্বান করছি। আমরা আহ্বান করছি- বর্তমানের চালু এই ইসলামটা আসলে আল্লাহ রসুলের ইসলামই নয়, ব্রিটিশ খ্রিষ্টানদের শেখানো ইসলাম, এই বিকৃত ইসলাম পরিত্যাগ করে, প্রত্যাখ্যান করে আবার আল্লাহ রসুলের প্রকৃত ইসলামে প্রবেশ করতে। আমরা জানি এই আহ্বান সহজ নয়, কারণ শত শত বছর ধরে যে দীন বিকৃত হয়ে গেছে এবং খ্রিষ্টানদের তৈরি করা যে আকিদা আমাদের মন-মগজের গভীরে ঢুকে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে, তাকে উপড়ে ফেলে সেখানে আবার আল্লাহ রসুলের দেয়া প্রকৃত আকিদাকে প্রতিষ্ঠা করা হেলা-খেলা কথা নয়। কিন্তু সহজই হোক আর কঠিনই হোক আহ্বান আমাদের করতেই হবে নইলে বিচারের দিন আল্লাহকে আমাদের কোনো কৈফিয়ৎ দেবার থাকবে না। আল্লাহর কাছে আমাদের শুধু এই জবাবই হবে- আমরা তোমার প্রকৃত ইসলামের দিকে, তোমার প্রকৃত তওহীদ, সেরাতুল মুস্তাকিমের দিকে মানুষকে ডেকেছি- তোমার কোর'আনের সুরা নহলের ১২৫ নম্বর আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী অর্থাৎ হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং সদ্ভাবে, কিন্তু ঐ আয়াতেই তুমিই বলেছো তোমার পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয় এবং কে তোমার পথে থাকে সে সম্বন্ধে তুমি সম্পূর্ণ অবহিত, সচেতন। ইয়া আল্লাহ। হেযবুত তওহীদের এই প্রচেষ্টা তুমি কবুল কর। তোমার অসীম শক্তি থেকে আমাদের সাহায্য কর। বর্তমানের বিকৃত ও বিপরীতমুখী ইসলাম থেকে তোমার বান্দাদের উদ্ধার করে তুমি যে দীন আদম (আ.) থেকে মোহাম্মদ (দ.) পর্যন্ত নাযেল করেছ, সেই দীনুল ইসলাম, সেই দীনুল কাইয়্যেমায়, সেই দীনুল হক-এ, সেই দীনুল ফেতরায় আমাদের আবার প্রবেশ করাও। আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই। তুমি তোমার অপার ক্ষমায় আমাদের মাফ করো, আমাদের হেদায়াত করো এবং আমাদের আবার তোমার তওহীদ আর তোমার শেষ রসুলের শিক্ষা পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করে তোমাকে ইবলিসের বিরুদ্ধে জয়ী করার জেহাদের সুযোগ করে দাও। -আমীন।

লেখক পরিচিতি

মানবতার কল্যাণে নিবেদিত অরাজনৈতিক আন্দোলন হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। তিনি এমন এক ঐতিহ্যমণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান যাদের এ উপমহাদেশে শিক্ষা, ধর্মবিস্তার, সংস্কৃতি ও সমাজসেবায় বিপুল অবদান রয়েছে।

তিনি ১৯২৫ সনের ১১ই মার্চ ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব কাটে নিজ গ্রামে। তিনি টাঙ্গাইলের এইচ. এম. ইনস্টিটিউশন থেকে ১৯৪২ সনে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। এরপর সা'দত কলেজে এবং বগুড়ার আজিজুল হক কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম বর্ষ শেষ করে দ্বিতীয় বর্ষে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। এখানে শিক্ষালাভের সময় তিনি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে সম্পৃক্ত হন। সেই সুবাদে এই সংগ্রামের কিংবদন্তিতুল্য নেতৃবৃন্দের সাহচর্য লাভ করেন যাঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্, অরবিন্দু ঘোস, শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দি, মাওলানা আবুল আলা মওদুদী অন্যতম। ১৯৬৩ সনে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগের প্রার্থীগণসহ বিপক্ষীয় মোট ছয়জন প্রার্থীকে বিপুল ব্যবধানে পরাজিত করে এম.পি. নির্বাচিত হন। প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য থাকা অবস্থায় তিনি 'কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এ্যাসোসিয়েশন' এর সদস্যপদ লাভ করেন। এছাড়া তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। শিকার, খেলাধুলা, রাইফেল শুট, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা, সঙ্গীতাঙ্গণ ইত্যাদি দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল।

তিনি ছোটবেলা থেকেই মুসলিম জাতির ইতিহাস আর বর্তমানের মধ্যে বিরাট পার্থক্য লক্ষ করে রীতিমত সংশয়ে পড়ে যান যে, এরাই কি সেই জাতি যারা শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সামরিক শক্তিতে, ধনবলে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান জাতি? কীসের পরশে এই জাতি ১৪০০ বছর পূর্বে একটি মহান উম্মাহয় পরিণত হয়েছিল আর কীসের অভাবে আজকে তাদের এই চরম দুর্দশা?

অবশেষে মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি ধীরে ধীরে এ সকল প্রশ্নের উত্তর লাভ করলেন। তিনি এ জাতির মুক্তির লক্ষ্যে মুসলমানদের আবার তাদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে দেওয়া জন্য একটি সংগঠন গঠন করেন যা ১৯৯৫ সনে হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সূচনা করে। সত্য প্রচার করতে গিয়ে তিনি একাধিকবার কারাবরণ করেন এবং নিজের সকল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেন। ২০১২ সালের ১৬ জানুয়ারি এ মহান ব্যক্তিত্ব পরলোকগমন করেন। ৮৬ বছর বয়সে ক্ষুরধার লেখনী ও প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তব্যের মাধ্যমে এই মৃতপ্রায় জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি আপ্রাণ সংগ্রাম করে গেছেন।

যোগাযোগ: ০১৭১১০০৫০২৫, ০১৭৮৩৫৯৮২২২, ০১৭৬৮২৮৫৬২৪ (হোয়াটসঅ্যাপ)

www.hezbuttawheed.org
www.youtube.com/@hezbuttawheed
www.facebook.com/emamht